পরমব্রহ্ম স্বরূপ প্রদীপ্ত ভাস্কর

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

সাধো, অলখ-নিরঞ্জন সোঈ।
গুরুপরতাপ রামরস নির্মল, ঔর ন দুজা কোঈ।।
সকল জ্ঞানপর জ্ঞান দয়ানিধি, সকল জোতী পর জোতী
জাকে ধ্যান সহজ অঘনাসৈ, সহজ মিটৈ জম ছোতী।।

—**দরিয়া সাহব**

পরমব্রহ্ম স্বরূপের এক নাম ''অলখ-নিরঞ্জন''। 'অলখ' অর্থে বিশুদ্ধ জড় চৈতন্য যাহা সকল জ্যোতির আদি উৎস দিব্যজ্যোতি; আর তন্মধ্যে আত্মসত্তার নিমজ্জন বা বিসর্জন নির্বিকল্প মহানির্বাণ সমাধিপদ পরমব্রহ্ম স্বরূপের এক নিত্য অক্ষয় অবস্থা বিশেষ। এই অলখ-নিরঞ্জন রূপী পরমব্রহ্মপদকে স্থূল সত্তায় অবতরণ করাইয়া প্রকাশ্যে সচলশিব রূপে প্রায় দুই কল্পাধিককাল বিরাজিত ছিলেন জীবন্মুক্ত ভগবৎবেত্তা মহাত্মা পরমব্রহ্মস্বরূপ প্রদীপ্ত ভাস্কর কাশীর সচল শিব শ্রীশ্রীতৈলঙ্গ স্বামী। সাক্ষাৎ ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে অব্যক্তভাবে সনাতন ধর্মসত্যকে রক্ষা করিতে সর্বব্যাপী জগন্নাথদেবের ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মর্ষি ঋষি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ স্বারূপ্য লভ্য মহাত্মা বশিষ্ঠাবতার শ্রীশ্রীতৈলঙ্গ স্বামী। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র মহাত্মা-দেবতাত্মা মণ্ডলে ইনি আদিযুগ হইতে অতি সুপরিচিত। সেই কারণে আত্মোপলব্ধির আসনে বসিয়া ''মম'' শিবগুরু সদৃশ চিরন্তন এই মহাবতারের জন্মজন্মান্তরের আলেখ্য আজ সমগ্র জগৎবাসীর সম্মুখে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি যাহাতে কিনা মানব সমাজের শ্রদ্ধাভক্তি ভগবৎচেতনার প্রতি আরও বর্দ্ধিত হয় এবং পৃথিবীর এই দুর্দিনে তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

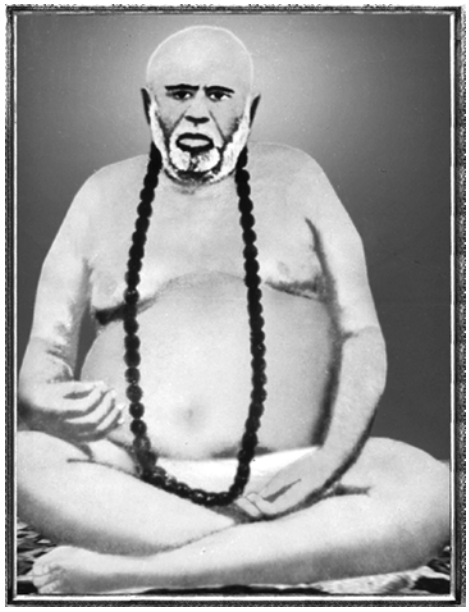

সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের প্রতিভূ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর লীলাকাল প্রায় ৩০০ বৎসর ব্যাপৃত। এই সমগ্র লীলাকাল ব্যাপী তাঁহাকে আমরা ভারতবর্ষের বহুতীর্থে দর্শন পাই শুধুমাত্র এক অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতি সম্পন্ন যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তিধর মহাত্মারূপে। কিন্তু অবশেষে তাঁহার জীবনবেধ লীলা-মাধুর্য্য প্রমাণিত করে যে তিনি প্রকৃতই কাশী-বারাণসীর সচল বিশ্বনাথ। তাঁহার জীবন-লীলা কালের এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ পদের অংশাবতার রূপে শ্রীশ্রীবলরাম শক্তিপদে আসীন হইয়া সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেহ ধারণ পূর্বক জগৎকে ও জীবকে সনাতন সত্যধর্মের শিক্ষা প্রদান করিতে দেখা যায়। যেমন, পুরুষোত্তম 'শ্রীরাম' রূপের মাহাত্ম্য জনসাধারণে প্রচার করিতে তিনি উত্তর ভারতে গোস্বামী তুলসীদাস রূপে অবতীর্ণ হইয়া ''রামচরিত মানস'' রচনা করিলেন এবং পরে মহাত্মা জনার্দ্দণী নামে উত্তরপ্রদেশেই 'রাম-মহিমা'র গুণ গাহিলেন তৎপূর্বে বাংলায়, কৃত্তিবাস ওঝা রূপেও তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' রচনার মাধ্যমে বাংলার গ্রামে গ্রামে শ্রীরাম রস নির্মল যশ-গাথাকে প্রচার করিয়াছিলেন নবধাভক্তি সাধনের ধারায়। আবার অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে বৈষ্ণব আরাধনায় নিযুক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-ধামতৃষ্ণ স্বারূপ্য লব্ধ করিতে 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ ও পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা কবি জয়দেব রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েন, তদনন্তর শ্রীচৈতন্যের পরেই গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং ইহারও পূর্ববর্তীকালে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বাসুলী উপাসক দ্বিজ চণ্ডীদাস রূপে; দ্বিজ চণ্ডীদাসের জীবনে শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্ত সাধনার ধারায় দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি কবিকঙ্কন রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, দাশরথি রায়, গয়ার পরাশর ও শেষে যুগাবতার বরিষ্ঠ আধ্যাত্মিক জগতের নবজাগরণের সূচক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বরূপে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সময়ে শ্রীজগন্নাথ-

শ্রীবলরাম সত্তাদ্বয়ের মহামিলন হইল কাশীতে শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূত সান্নিধ্যে। অন্যদিকে এই সময় পূর্বাপর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সত্তারূপী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ আবির্ভাব হইল ধরাধামে এই বঙ্গভূমিতে প্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দর রূপে। এই মহাশুভ সন্ধিক্ষণের কিছু সময়ের ব্যবধানে শ্রীশ্রীতৈলঙ্গ স্বামীর কিছু পূর্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মর্ত্যলীলা সংবরণ করিলেন, এমনই ঘটনার প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। যোগী সম্রাট মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের অসীম অনুকম্পায় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ''সম্ভবামি যুগে যুগে''র তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া আজ আধ্যাত্মিক জগতের অন্তর্নিহিত রহস্যকে কিছুটা বিশ্বাসী ভক্তজনের সম্মুখে প্রকাশ করিলাম।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ইহ জগতে অবস্থিতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্মজগতের বিভিন্ন মতাবলম্বী বিরাট মহাত্মাগণেরা সেই সময় ইহলোকে একে একে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং উহাদিগের অধিকাংশজনই শিবব্রহ্ম সচল শ্রীশ্রীতৈলঙ্গ স্বামীর চিন্ময় আলোকে কোনও না কোনও ভাবে আলোকিত হয়েন। যেমন, একদা শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামীজী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন,''এস তোমায় দীক্ষা দিই।'' বিজয় কৃষ্ণ বলিলেন, ''আমি ব্রাহ্ম, আমায় আপনি কি দীক্ষা দিবেন? তাছাড়া আপনার মত অনাচারীর কাছে আমি দীক্ষা নেবোও না।'' শান্ত কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন তৈলঙ্গস্বামী, ''বাবা, তোমায় দীক্ষা দিবার পিছনে রহিয়াছে আরও গুঢ় কারণ। আমি তোমার প্রকৃত গুরু নহি। তবে দীক্ষা না দিলে শরীর শুদ্ধ হয় না বলিয়াই কাজটা করিয়া দিতেছি।'' ''এস,'' বলিয়াই তিনি বিজয়কৃষ্ণকে ত্রিবিধ মন্ত্র দিয়া বলিলেন, ''অব্ যাও, মেরে পর ভগবান কো জো হুকুম থে বহ ম্যায় তামিল কিয়া।'' — অর্থাৎ, অক্ষয় বট বৃক্ষের চারাগাছটিকে মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী নাম-মন্ত্রের শক্তি দ্বারা বেড়া দিয়া দিলেন যাহাতে তাহার কোনও অকল্যাণ না হয়। এই প্রকারেই বহু মহাত্মার জীবনেই মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীজীর অশেষ কৃপা কল্যাণ আশীষ বর্ষিত হইত।

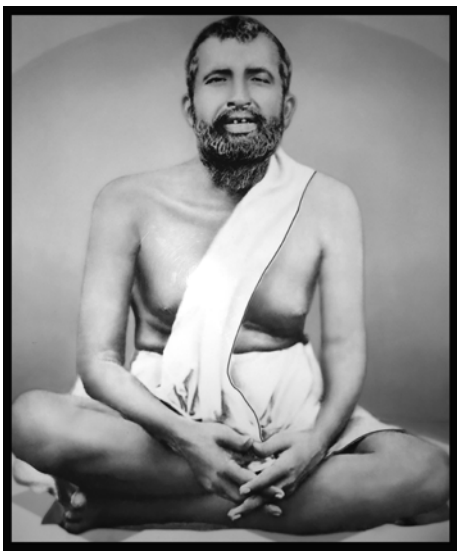

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৈলঙ্গস্বামীজীর মানসীকন্যা শঙ্করীমাতাজীর পবিত্র জীবনী গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে — সেটি ছিল ইং ১৮৬৮ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে আসিয়াছেন মথুরবাবু আর ভাগীনেয় হৃদয়ের সঙ্গে। বিশ্বনাথ দর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ চলিলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে 'সচল বিশ্বনাথ' দর্শনে। এই সময় শঙ্করী মাতাজী হিমালয় হইতে ফিরিয়া তৈলঙ্গস্বামীজীর সাধন কুটীরেই অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ স্বামীজীর সেবক মঙ্গলভট্টজী আসিয়া শঙ্করী মাতাজীকে বলিলেন, ''স্বামীজীর নিকট একজন বাঙালী সাধু আসিয়াছেন,বাবা উপরে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।'' শঙ্করীমাতাজীও গুরুর আদেশে উপরে তৈলঙ্গবাবার নিকটে আসিয়া দেখিলেন একজন শুভ্রকায় উজ্জ্বল দ্যুতিমান বিশিষ্ট বাঙালী সাধু স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে অন্য আরেকজন বাঙালী অভিজাত ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। মাতাজী পরে জানিয়াছিলেন যে ঐ সাধুই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আর বাঙালী ভদ্রলোকটি হইলেন জমিদার মথুরনাথ বিশ্বাস। সেস্থলে আলোচনার বিষয় হইতেছে — রামকৃষ্ণদেব প্রথমে হস্তের তর্জনী দেখাইয়া ও পরেই দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া স্বামীজীকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''ভগবান এক না দুই?''

স্বামীজীও তর্জনী উঠাইয়া ইশারায় বলিলেন, ''যখন সাধকের মন আত্মাতে বিলীন হইয়া সমাধিমগ্ন হয় তখন 'এক ভিন্ন দুই আর থাকে না'। তাকেই অদ্বৈতবাদ বলা হয়। আবার মন যখন ভগবানের সন্ধানে সাধন তৎপর হয় তখন দুই অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান। ইহাকেই দ্বৈতবাদ বলে। ভগবান এক ও দুই, তবে মূলে এক; দুটি দানা সংযুক্ত ছোলা বা চানা হইল ইহার উদাহরণ।'' শ্রীমৎ মঙ্গলভট্টজী স্বামীজীর ইঙ্গিতের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সাধারণত মঙ্গলভট্টজীই নবাগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের স্বামীজীর ইঙ্গিতের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। স্বামীজীও তাঁর ব্যাখ্যা সমর্থন করিতেন।

রামকৃষ্ণদেব — ''ধর্ম কি?'' স্বামীজী —''সত্য।'' রামকৃষ্ণদেব —''জীবের কর্ম কি?'' স্বামীজী — ''জীব সেবা।'' রামকৃষ্ণদেব —''প্রেম কি?'' স্বামীজী — ''ভগবানের নামে তন্ময় হইয়া যখন চোখে জল আসে তখনকার অবস্থার নাম 'প্রেম'।'' তৈলঙ্গস্বামীজীর নিশ্চল যোগমূর্তি দর্শন করিয়া ও যুক্তিপূর্ণ অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধি হইল। (এই ভাবসমাধিতেই একে অপরকে অভেদসত্তা বলিয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীসরোজ বাবার নিকট এমনটি শুনিয়াছি।) দুই চোখ বাহিয়া প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। স্বামীজী মাতাজীকে পাখা দিয়া বাতাস করিতে ইঙ্গিত করিলেন। শঙ্করীমাতাজীও পরমহংসদেবকে পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর সমাধি ভঙ্গ হইলে রামকৃষ্ণদেব তৈলঙ্গস্বামীজীর আসন বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া দুই হস্ত তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। পরে মথুরবাবুকে দিয়া প্রচুর পরিমাণে ক্ষীর আনাইয়া স্বামীজীকে নিজহাতে খাওয়াইয়া দিলেন। স্বামীজী স্মিতহাস্যে পরমহংসদেবকে একটি সোনার নস্যদানী এগিয়ে দিলেন। উভয়েই তখন প্রেমানন্দরূপ সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

তন্ত্রযোগমার্গ ও বেদান্ত যোগমার্গ, এই দুই সাধনের ধারায় স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিভাত অলখ নিরঞ্জনরূপী কাশীর সচল বিশ্বনাথ শিবব্রহ্ম শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামীজীর জীবন অধ্যাত্মমার্গে সাধন জগতে এক অমূল্য নিদর্শন । এমনটি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

পরম যোগীবর মহামুনি শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কৃপাধন্য শ্রীমাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের দৈনন্দিন ডয়েরী ''দি রেড বুক'' ও ''জীবনাভাস'' নামক পুস্তকে পাওয়া যায় যে দত্ত মহাশয়ের পিতামহ ঁকালীচরণ দত্ত, যিনি পরবর্তী জীবনে 'কালীমুক্তাওয়ালা' নামেই বিশদভাবে পরিচিত ছিলেন কারণ তিনি ছিলেন মুক্তার ব্যাপারী। তিনি মহাবতার বাবাজী মহারাজের অসীম কৃপাধন্য ছিলেন। একদিন কালীচরণ তাঁর কলিকাতাস্থ মুক্তার দোকানে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তাঁর দোকানের দ্বারপ্রান্তে হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি কালীচরণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, ''কিরে, যাবি না?'' উত্তরে কালীচরণ বলেন, ''প্রস্তুত প্রভু।'' ''তবে আয়'' — এই মন্তব্য করিয়া সাধু যেমন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, মন্ত্রমুগ্ধের মত কালীচরণও তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন। দোকান ও সিন্দুকের চাবিগুচ্ছ পড়িয়া রহিল, তার কর্মচারিগণ কোন কিছুই বক্তব্য রাখিতে সাহস পাইল না আর তার স্নেহের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাচরণ (মাণিকলালের পিতৃদেব) তখন কলিকাতা হইতে ২৩ মাইল দূরে চুঁচূড়া শহরে। এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরে বারাণসী ধাম হইতে তাহার পিতার স্বহস্ত লিখিত পত্র শ্যামাচরণের হস্তগত হইল। পত্রে কালীচরণ তাহার স্নেহভাজন পুত্র শ্যামাচরণকে লিখিয়াছিলেন যে, ''আমি গুরুজীর নির্দেশে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি, খোঁজ করিও না, পাইবে না।'' পরবর্তীকালে পিতার পত্রে পোষ্ট অফিসের শীলমোহর দেখিয়া বারাণসী ধামের উদ্দেশ্যে শ্যামাচরণ যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান করিয়া তাঁকে গৃহে ফেরানো। কিন্তু বারাণসীধামে উপনীত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে সাধু সন্তের আশ্রমে, চটিতে ও নানান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি তীর্থপ্রভাবে নিজেও সাধু ভাবাপন্ন হন এবং তাহার আত্মিক উৎকর্ষতা ঘটিয়া যায়। ফলে ঁকাশীধামের শিববাবা শ্রীতৈলঙ্গস্বামীর নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ পূর্বক আশ্রিত হন। পরে সাধুসঙ্গে সাধু প্রভাবযুক্ত শ্যামাচরণ জটাজুট সমন্বিত হইয়া দীর্ঘ ১২ বৎসর পর পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

ঈশ্বরকোটী মহাত্মাগণের জন্ম ও কর্ম দৈবসম্ভূত। মাণিকলালের জন্মের বহুপূর্বে যোগীপ্রবর তৈলঙ্গস্বামী শ্যামাচরণের নিকট দৈববাণী করিয়াছিলেন যে তাঁহার গৃহে ''ধনুরাশির'' লীলা হইবে। দৈববাণীর কিছুকাল বিগত হইলে পরে মাণিকলালের পুণ্য আবির্ভাব ঘটে ও পরবর্তীকালে জন্মচক্রবিচারে তাহার রাশি ''ধনু'' হওয়ায় তৈলঙ্গস্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণী সত্যরূপে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রের কথা দ্ব্যর্থক— অন্তর ও বাহিরে। বহির্জগতে জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ্‌গণ ''ধনু রাশি''র গুণাগুণ বহু প্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অন্তর্জগতে ইহার অর্থ ভগবানে অনুগত যে 'মন' যখন অণুসদৃশ আত্মজ্ঞানলব্ধ হয় তখন 'মনু' বলিয়া পরিগণিত হইলে পরে সেই মনঃচেতনায় শ্রীভগবানের অমৃতবাণী 'ধ্বনিত' হয় এবং তখন তাহা 'ধনু' নাম ধারণ করে। দ্বাপরে এই 'ধনু' ধারণ করিয়াছিলেন মহাবীর ধনুর্দ্ধর পার্থ। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতায় বলিলেন, ''যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণো, তত্র পার্থো ধনুর্দ্ধর।''

ধর্মানুরাগী পিতামহ কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের গুরুপ্রাপ্তি, গুরুদীক্ষা ও গুরুপরিচয়ের প্রামাণ্য কোথাও পাওয়া না গেলেও কিন্তু তাঁর কলিকাতার দোকানের কর্মচারী ও তাঁর পুত্র শ্যামাচরণ প্রমুখাৎ যে বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায় তাহা

এই যে মাণিকলালের জন্মের পূর্বেই কালীচরণ সংসার ত্যাগী হইয়া যে অলৌকিক মহাপুরুষের অনুগমন করেন তিনিই উত্তরকালে এক মহালগ্নে মাণিকলালের প্রতি অশেষ কৃপাপরবশ হইয়া তাকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া ছিলেন। এই অলৌকিক মহাপুরুষই হইলেন মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ। এইরূপেই লোকসমাজের নেপথ্যে দুই ভগবৎকল্প মহাপুরুষের জগৎকল্যাণ কর্ম সম্মিলিত ধারায় আজও চলিয়া আসিতেছে।

এই সৃষ্টিমধ্যে ব্রহ্মবেত্তা নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাগণের সত্তাবোধের প্রাণময় প্রবাহ বা জীবন ধারার প্রবাহ অবতারত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যদৃষ্টি দিয়া অবলোকন করিলে উপলব্ধি করা যায় যে উহাদের জীবন-প্রবাহ ধারা হইল অবিচ্ছেদ্য। একই সময়ে জগতের প্রয়োজনে যুগোপযোগী একের অধিক দেহধারণ করিয়া এঁনারা বিশ্বজগৎকল্যাণ কর্মে কেহ কেহ সর্বদাই নিযুক্ত থাকেন। বশিষ্ঠাবতার মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী হইলেন সেই সকল পরম কৃপাময় উদার মহাত্মাদের মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম একজন, যাঁহার জগৎকল্যাণের অবদান অনন্ত ও অসীমে পরিব্যাপ্ত।

— ওঁ তৎ সৎ —